বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে মৃত্যুচিন্তার ইতিহাস: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৭৭২-১৯২০)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা শাখার ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি. (আর্টস) (Doctor of Philosophy) (in Arts) এর জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভের

সারসংক্ষেপ

গবেষক

অনির্বাণ দাস

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: JU/PHD/History/A00HI1101016

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২

ইতিহাস বিভাগ,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২

২০২৩

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে মৃত্যুচিন্তার ইতিহাস: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৭৭২-১৯২০)

ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মৃত্যু, মৃত্যু ভাবনা বা চিন্তা বিশেষভাবে সমব্যাপ্ত। মৃত্যুর ইতিহাস ও মৃত্যু চেতনার ইতিহাস একই মাত্রায় আলোচনা করা বা তাকে বিষয়গত করা খুব কঠিন কাজ। আবার অপরদিকে এও সত্যি যে চেতনা ছাড়া মৃত্যুর ইতিহাস নির্মাণ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ চেতনা বিশেষত, ভাষা দর্শন ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে অনুষঙ্গগুলির জন্ম নেয় যেমন শোক, দুঃখ, বেদনা এগুলির সবগুলি চেতনারই বিশেষ বিশেষ বর্গে অবস্থান করে। মৃত্যুর ইতিহাসে একধরনের সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক দিক উঠে আসে। আবার গভীর জ্ঞানের দার্শনিক কামনা, বাসনা, ইচ্ছা এই বিমূর্ত অনুভূতিগুলো মৃত্যু, মৃতদেহের ইতিহাস, বা সমষ্টিগত মৃত্যুর ইতিহাস থেকেই উঠে আসে। মৃত্যুর ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে চেতনার অন্তরালে মৃত্যুর বহুমাত্রিকতার যে দার্শনিক প্রকল্প তা বারে বারে আমাদের চিন্তায় সংযোগ ও বিয়োগ এনেছে। সেখানে একটি প্রশ্ন প্রথমেই উঠে আসে তা হল মৃত্যু কি? এটিতো শুধুমাত্র একটি প্রশ্ন নয়, বরং এর সাথে জড়িয়ে পড়ে অনেকগুলি প্রশ্নের আশ্রয়। সাধারণভাবে কিছু গতে বাঁধা ঐতিহাসিক কালিকতা, কার্যকারণ তত্ত্ব, বোধগম্য ছাঁচের সাথে খাপ খায় না। 'মৃত্যু কি?' এটি শুধুমাত্র একটি প্রশ্ন নয়, একটি বাক্য হিসেবে ভাবা যেতেই পারে। আর এই প্রশ্ন করলে সেইসঙ্গে তার উত্তরের সন্ধান একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যদি উত্তর পাওয়ার বদলে আরও নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়, তাহলে, প্রশ্ন-উত্তর এর যে আধুনিক কাঠামো, তা দিয়ে মৃত্যুর সম্পর্কিত অনুষঙ্গগুলিকে সম্পুর্ণ ভাবে বোঝা সম্ভব নয়। এই আলোচনা প্রসঙ্গে চলে আসে মিথ, ভৌতিক গল্প, পুরাণ, আত্মা ও শোকযাপনের ইতিহাস। উইটগেইন্সটাইন এর মতে, মৃত্যু কি এ

প্রশ্নের উত্তর সরাসরি ভাষার মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়। বরং জীবনযাপনের মধ্যে দিয়েই বুঝতে হবে মৃত্যুর ধারণা। কারণ, মৃত্যু কি একটি মৌলিক বচন বা 'Elementary Proposition'। মৃত্যু চিন্তা ও তার চেতনা আলোচনা করতে হলে তার আগে 'জীবন' বলতে কি বোঝায় এবং তার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও বিজ্ঞান চেতনাকেও বুঝতে হবে। কারণ দেহের শেষ মানেই কি মৃত্যু অথবা দেহের যান্ত্রিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বন্ধ হলেই কি মৃত্যু ঘোষণা করা যেতে পারে, নাকি দেহ একটি মিডিয়াম। মৃত্যুর পরেও মৃত মানুষের স্মৃতি সমাজের কাছে, ব্যক্তির কাছে বা তার অশরীরী উপস্থিতি এবং তার অস্তিত্বের থাকা বা না থাকার প্রমাণ দেয়না। রবীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে মীরা দেবীর পুত্র নীতিন্দ্রনাথ যখন জার্মানিতে মারা গেলেন, এক চিঠিতে তিনি তাঁর কন্যাকে জানিয়েছিলেন, 'মৃত্যুই তো সব শেষ নয়, যদি সব শেষ হত তাহলে ভালবাসা থেকে যায় কেন?' অর্থাৎ মৃত্যু জীবনের একটি স্বাভাবিক পরিণতি। এই পরিণতি ব্যক্তিকে আরও ব্যক্তিগত করে তোলে, সমাজকে আরো সামাজিক অনুভূতির দিকে ঠেলে দেয়। দার্শনিক দেরিদাও মৃত্যু এবং শোক সম্পর্কে বলেছিলেন যে, মৃত ব্যক্তি জীবিত সদস্যদের চেতনার অনুভূতিকে আরও বৃহৎ করে দেয়। জীবিত কালের স্মৃতি মৃত্যুর পর আরও ব্যাপ্তি পায়। বিচ্ছেদই যেন এই স্মৃতিকে আরও গভীর থেকে গভীরতর করে তোলে। উইটগেইন্সটাইন এর মতে, মৃত্যু অভিজ্ঞতা প্রতীয়মান হয় না বলে, তা জীবনের কোন ঘটনা নয়। সুতরাং জীবন অভিজ্ঞতারই সমষ্টি। 'My experiment with truth' গ্রন্থে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন- "I live and move and have my being in pursuit of this goal (moksha). All that I do by way of speaking and writing, and all my ventures in the political field are directed to this end. I live and move and have my being in pursuit of this goal".[1] এই মোক্ষ গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনকে

[১] Mahatma Gandhi, *My Experiment with Truth*, p.6

পরিচালিত করেছিল। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মৃত্যু একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে সতীদাহ প্রথা থেকে শুরু করে বিংশ শতকের মধ্যবর্তী পর্যায় পর্যন্ত বিপ্লবীদের আত্মবলিদান শহিদ ও অমরত্ব ঔপনিবেশিক রাজনীতির দমন পীড়নকে এক আত্মঅভিমানের পর্যায় নিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ রামমোহন থেকে গান্ধী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে মৃত্যু, মৃতদেহ ও শ্মশান ব্যবস্থা, শহিদ ফলক এই জড় উপাদানগুলিও এক সাংস্কৃতিক চিহ্ন ও প্রতীকের মধ্যে দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চা মানসিক দন্দ্বের পটভূমিকা তৈরি করেছিল। বিশেষত বিপ্লবীদের আত্মবলিদান ভারতীয় ধর্ম চেতনার মধ্য দিয়ে যে অমরত্বের সন্ধান তা উপনিবেশিক শাসকদের যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছিল। আমার গবেষণার প্রকল্পে চারটি অধ্যায় বিন্যাসের মাধ্যমে দেখাবার চেষ্টা করেছি, মৃত্যু বা মৃত মানুষের ইতিহাস কিভাবে ইতিহাস বিষয়টিকেই অর্থময় করে তোলে। মৃত্যু ও তার পরিণতি, শোক, দেহ থেকে রাজনীতি প্রভৃতি দার্শনিক বর্গ গুলিকে মৃত্যু সবিকল্প জ্ঞানতত্ত্বের আঙিনায় নিয়ে আসে। গবেষণার সময়সীমা ১৭৭২ থেকে ১৯২০ দশক অবধি সীমাবদ্ধ রেখেছি। ১৭৭২ সময়সীমা থেকে গবেষণা শুরু করার উদ্দেশ্য হল রাজা রামমোহন রায় ও তার সতীদাহ প্রথা রোধ করার মাধ্যমে অসংখ্য নারী মৃত্যুর যে ঘটনা ও তার তৎকালীন দার্শনিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মল্লভূমিতে যে জড় ও অ-জড় চেতনার বাগ বিতণ্ডা শুরু হয়েছিল তা ভারতবর্ষকে ভবিষ্যতের সীমানার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল আর এখানেই আমার গবেষণার মূল প্রকল্পকে আমি ধরবার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও সতীদাহ প্রথাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক কর্ম কাণ্ড গড়ে উঠেছিল তাও আমার গবেষণার অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। ১৯২০ এর দশকে গবেষণা শেষ করেছি মূলত গান্ধীজীর আবির্ভাব ও ভারতের রাজনৈতিক দর্শন ও তার প্রেক্ষাপট বদল। ১৯২০ এর দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আগমনের ফলে মৃত্যু চেতনাতেও বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

গান্ধীয় দর্শনে মৃত্যু চেতনার পরিবর্ত বিকল্প রূপ হল অহিংসা ও মোক্ষের ধারণার জন্ম লাভ করা। সেইজন্য চেষ্টা করেছি ১৯২০ এর মধ্যে গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রাখার। তবু একথা সত্যি আমার গবেষণার আলোচনা প্রসঙ্গে সবসময় ঐতিহাসিক কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারিনি। গবেষণার প্রয়োজনে কখনও প্রাচীন ভারত, কখনও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, কখনও প্রাচীন বিশ্বের ইতিহাস, কখনও মহাকাব্য, পুরাণ ইত্যাদি বিষয়গুলিতে ফিরে যেতে হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সতীদাহ প্রথা আলোচনা করতে গেলে প্রসঙ্গক্রমে সহমরণ, অনুমরণ, শাস্ত্র, মনুস্মৃতি এ বিষয়গুলি চলে আসে। আবার মৃত্যু চেতনার ইতিহাস বলতে গিয়ে রামমোহন অক্ষয় কুমার দত্ত, কেশব চন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখদের মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা যেমন অপরিসীম গুরুত্ব দিয়ে দেখেছি, অপরদিকে ফ্রয়েড, উইটগেইন্সটাইন, লাঁকা, দেরিদা, হাইডেগার এঁদের চিন্তা ভাবনার কাছেও বারেবারে ফিরে যেতে হয়েছে। কারণ রামমোহনের সতী বুঝতে গেলে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের দার্শনিক প্রত্যয়গুলিকে আগে বুঝতে হবে। আমি আমার গবেষণার প্রকল্পকে বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। অধ্যায় বিন্যাসের মধ্য দিয়ে একটি বৃহৎ মৃত্যু চেতনার ইতিহাসকে ধরবার চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে মৃতদেহের অগ্নিসৎকার বা তাকে দাহ করা ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে একটি প্রধান ও অন্যতম রীতি। একইসঙ্গে এটা নিরীক্ষিত যে বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখরা মৃতদেহ অগ্নিসৎকারে বিশ্বাস করে না। এমনকি বেশিরভাগ নিম্নবর্গের হিন্দুরা মৃতদেহ পোড়ানোতে বিশ্বাস করত না। উনিশ শতকীয় চিন্তাবিদরা মনে করতেন অগ্নিসৎকারের ধারনার জন্ম ভারতবর্ষে মূলত আর্যদের আগমনের সাথে সাথে। মনে করা হয় ভারতবর্ষ থেকেই অগ্নিসৎকার প্রথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গিয়েছিল। যদিও এ নিয়ে দ্বিমত আছে। ঐতিহাসিকগতভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের আদিপর্বে অগ্নিসৎকারের ব্যবস্থা ছিল না, কেন ছিল না তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত বা বহুমত আছে। একথা ঠিক যে প্রাক্ বৈদিক পর্বে মৃতদেহকে

কবর দেওয়া হত এবং তার এক ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। পরবর্তীকালে আর্যদের আগমনের সাথে সাথে এই ঐতিহ্যের ছায়া সমসাময়িক মৃতদেহের সৎকারের পদ্ধতিকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কবর ব্যবস্থার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ঐতিহাসিকদের বহু যুক্তি আছে এবং এই যুক্তির বেশিরভাগ আধার বা বয়ান মূলত ধার্মিক বা অতিন্দ্রিয়বাদের উপর নির্ধারিত। এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন হওয়ার আছে তা হল কেন, কবে, কিভাবে কবর ব্যবস্থা থেকে অগ্নিসৎকার ব্যবস্থার প্রচলন ভারতবর্ষে হল? এই পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক বর্গটিকে বুঝতে হলে, সমসাময়িক সমাজে ধর্মীয় চেতনার স্তরগুলিকে বুঝতে হবে, কারণ এখানে ইতিহাস চর্চার পদ্ধতিগত কাঠামোটিকে প্রচলিত ধারনা ও তার বাইরে গিয়েও প্রচলিত কার্যকারণ পদ্ধতিকে প্রশ্ন না করলে এই রূপান্তরের সঠিক কারণ অনুধাবন করা সহজ কাজ নয়। কারণ মৃতদেহ সৎকার ব্যবস্থাটির যে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার দিক আছে তা মূলত মানুষের কল্প কাহিনী ও বিশ্বাসের উপর আধাররত যা আবার চোরাস্রোতের মত প্রচলিত ঐতিহাসিক ধ্রুব সত্য ব্যবস্থাকে কখনও আলোকিত, কখনও সংশয়ের দিকে নিয়ে গেছে। হয়ত সেই জন্যই ইতিহাসের গর্ভে এক সত্যের বদলে বহু সত্যের জন্ম নেয় এবং ইতিহাস নবীন হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক K. Rebay-Salisbury-এর মতে কবর ব্যবস্থা থেকে অগ্নিসৎকার ব্যবস্থায় রূপান্তরের মধ্যে ‘Belief system’ কতটা প্রভাবিত হয়েছে বা করেছে তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তার মতে এই ‘Belief system’ সমাজেরই এক কল্পিত ধারণা যা সমাজকেই সামাজিকতা দেয়। তার মতে এই রূপান্তরের কারণটিকে কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য করা যায় তা তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা নির্মানের যে যুক্তিকাঠামো তাকে নমনীয় করে নতুন যুক্তি নির্মান করার পথ প্রসারিত করতে হয়েছিল না হলে শুধুমাত্র সামাজিক নীতিগত সিদ্ধান্ত দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক বর্গকে পরিবর্তিত করে এর একটি নব্য পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তিকরন সম্ভব ছিল না। কবর ও অগ্নিসৎকার ব্যবস্থার মধ্যে একটি সমানুপাতিক দ্বন্দ আছে। কবর ব্যবস্থার মাধ্যমে

মৃতদেহকে রক্ষা করার মাধ্যমে মৃতদেহের পুনর্জীবন সম্ভব যা অগ্নিসৎকারের মাধ্যমে সম্ভব নয় বলে তৎকালীন কবর ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি উঠেছিল। অপরদিকে একথাও সত্যি যে এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে আভ্যন্তরিন অন্তরদ্বন্দ আছে অর্থাৎ অগ্নিসৎকারের মাধ্যমেও আত্মার পুনর্জন্ম সম্ভব কারণ অগ্নিসৎকারে বিশ্বাসী মানুষেরা মনে করতেন আত্মা অবিনশ্বর। বিখ্যাত ঐতিহাসিক Sorensen and Bille প্রশ্ন তুলেছেন, কেন পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজ ব্যবস্থায় অগ্নিসৎকার ব্যবস্থাকে মৃতদেহ জীবাত্মা থেকে পরমাত্মায় রূপান্তরের ব্যবস্থা হিসেবে মনে করা হয়। এখানে তারা অগ্নিকে একটি সাংস্কৃতিক চিহ্ন হিসেবে দেখতে চেয়েছেন যার অতলে আছে গভীর বিজ্ঞান বোধ । মৃতদেহ কেন অগ্নির মাধ্যমে সৎকার করা যেতে পারে এ প্রশ্নটি আসাও প্রাসঙ্গিক। মনে করা হয় প্রাক ঐতিহাসিক পর্ব থেকে ধ্রূপদী যুগ পর্যন্ত অগ্নি বা আগুন একটি প্রযুক্তির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হত (Pyrotechnics)। আগুনের মাধ্যমে খাদ্য, তৈজস পত্রাদি তৈরী, ধাতব বস্তু গলানো, এছাড়া আরও অনেক কিছুতে আগুনের ব্যবহার করা হত। তৈজস দ্রব্যাদি আগুনে পোড়ানোর জন্য যে চুল্লি তৈরী করা হত, মৃতদেহ অগ্নিসৎকারে যে চুল্লির ধারনা মনে করা হয় তা এখান থেকেই এসেছিল। ভারতবর্ষে প্রথম অগ্নিসৎকার প্রামাণ্য হিসেবে পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। ১৫০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে অধুনা পাকিস্তানে এই প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃত স্তোত্র সংকলিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ঋগ্বেদ গ্রন্থের চারটি স্তর রয়েছে। যথা: "সংহিতা", "ব্রাহ্মণ", "আরণ্যক" ও "উপনিষদ্"। "ঋগ্বেদ সংহিতা" হল এই গ্রন্থের মূল অংশ। এই অংশে দশটি “মণ্ডল” বা খণ্ড এবং সর্বপরি মোট ১০২৮ টি “সুক্ত” বা স্তোত্র নিয়ে সংকলিত এবং সব মিলিয়ে মোট মন্ত্রের সংখ্যা ১০,৫৫২ টি। ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলে সূক্ত ১৫ এর ১৪ তম স্তোত্র থেকে ভারতবর্ষে প্রথম অগ্নিসৎকারের ধারনার প্রমাণ মেলে। ইউরোপে মৃতদেহ সৎকারের মাধ্যম হিসেবে অগ্নিসৎকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে মনে করা হত। যদিও খ্রিস্টধর্মে শবদাহ সম্পর্কে ‘*New Testament*’

এ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইউরোপে খ্রিস্টপূর্বে শবদাহ ব্যবস্থা চালু থাকলেও তা শুধুমাত্র ধর্মীয় মোহ বিশ্বাসের জালে আবদ্ধ থাকেনি বরং এই ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের দিকটিও প্রাচীন আমলে সামাজিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু কখনোই ধর্মীয় ভাবে আবদ্ধ ছিল না। একথা মনে করা যেতে পারে মৃতদেহের দাহ করার ভাবনার মূল উৎস হলো স্বাস্থ্যসংক্রান্ত চিন্তা।এখানে ধর্মীয় শিরোনামের যতটা না প্রয়োজন তার চেয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের বাস্তবিক ভাবনার প্রয়োজন বেশি।ফলত ইউরোপীয়রা শবদাহকে ধর্মহীন প্রথা বা পদ্ধতি হিসেবে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু একথা সত্য যে অগ্নিসৎকার প্রথা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গভীর শিকড় থাকা সত্বেও পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের কাছে তা কখনোই যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়নি। তাদের প্রশ্নটা যতটা না ঐতিহাসিক তারচেয়ে বেশি ধার্মিক। উনিশ শতকে 'হিন্দু অগ্নিসৎকার প্রথা' ব্রিটিশদের কাছে একটি 'ভৌতিক ' ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। ১৮৭০ পর্যন্ত শবদাহ ব্যবস্থা পশ্চিমের সভ্যতা গুলির কাছে একটি জঘন্য ও অমানবিক ক্রিয়া-কলাপ হিসেবে দেখা হয়েছে। শবদাহ সম্পর্কে এই ধারণা তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটে অংশত সতীদাহ সম্পর্কে তাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া যা সাধারণ শবদাহ সংস্কারকেই ইউরোপীয়রা ভয়ঙ্কর ও জঘন্য বলে মনে করেছেন। মূলত অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পশ্চিমের ব্যক্তিবর্গ চিন্তাবিদরা সরাসরি ভারতীয় সাংস্কৃতিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে লাগলো। ব্যক্তিগত সংবেদনশীলতা ছাড়াও ইউরোপীয়রা শবদাহকে অস্বাস্থ্যকর ও দূষণ হিসেবে দেখতে চেয়েছে। ১৮৫৯ সালে বেঙ্গল ইন্সপেক্টর জেনারেল Frederic J. Mouat শ্মশান ঘাট থেকে নির্গত ধোঁয়ার গন্ধ সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন, "nauseous and disgusting to the last degree"। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন অবসান ঘটার পর ব্রিটিশ রাজতন্ত্র শাসনভারের দায়িত্ব নিলে তখন প্রাদেশিক শাসক ও কেন্দ্রীয় শাসন নতুনভাবে গঠিত পৌরসভার মাধ্যমে হিন্দু ক্রিমেশন

ঘাটগুলিকে শহরের মূল কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। Sir Cecil Beadon এর আদেশে কলকাতায় আধুনিক চুল্লি গড়ে তোলা হয়েছিল, যাতে অর্ধ পোড়া মৃতদেহ ও অপরিচ্ছন্ন শবদাহ ঘাট না থাকে। এরপরই Municipalityর তরফ থেকে চুল্লি নির্মাণের ব্যবস্থা করা হলো হুগলি নদীর তীরবর্তী প্রাচীন শবদাহ ঘাটে। একদিকে পাশ্চত্য ধারণায় অগ্নিসৎকার আরো প্রবল ভাবে গ্রহণ-বর্জন চলছে , উল্টোদিকে হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীও ধর্মে হাত পড়েছে বলে চিৎকার জুড়েছে। এইখানেই ঔপনিবেশিক শাসকদের, 'Scientific Cremation' বক্তব্যটি আরও যুক্তিযুক্তভাবে বৈধতা পায়।সাধারনভাবে শবদাহ ব্যাবস্থা নিয়ে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রাথমিক ভাবে নেতিবাচক মনোভাব থাকলেও পরবর্তী কালে তা কিছুটা সংশোধিত হয়েছিল একমাত্র শবদাহ ব্যাবস্থার মাধ্যমেই "রোগজীবাণুর পূর্ণ মৃত্যু" সম্ভব।যদিও উপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে ভারতীয়দের 'উন্মুক্ত অগ্নিসৎকার' বনাম বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্নিসৎকার নিয়ে দীর্ঘ বিবাদ হয়েছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে ‘মহামারী’ ও ‘মৃত্যু’ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহামারী ও মৃত্যু- এই দুটি শব্দ বোধহয় সবচেয়ে বেশি আলোচিত, রচিত ও সমালোচিত শব্দ। মহামারী ও মৃত্যু, দুটি বিষয় কিভাবে সম্পর্কিত হয়েছে, অর্থাৎ বলতে চাইছি সম্পর্কের ধরনের আদান প্রদানের মধ্যে মহামারী ও মৃত্যু কিভাবে যুক্ত ও বিযুক্ত? মৃত্যু তো জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু মহামারী বা অতিমারী মৃত্যুকেই ব্যাঞ্জনাময় করে তোলে অর্থাৎ অস্বাভাবিক মৃত্যু বা কম সময়ে বহু মানুষের মৃত্যুতে, মৃত্যু আর জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে থাকে না। এখানেই ইতিহাসে কার্যকারণতত্ত্বে আলোচনা বা প্রসঙ্গ চলে আসে।ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মহামারী, অতিমারী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, কারণ মহামারী বা অতিমারী কোন দৈব ঘটনা নয়। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি মহামারী বা অতিমারীর কারণ হিসেবে রাষ্ট্র, বিজ্ঞান,ধর্ম বহুমাত্রিক ভূমিকার অবদান রেখেছে, তাই আজও ইতিহাসে স্বাভাবিক

ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর দুটি শ্রেনীবিভাগ আছে, আর শ্রেনীবিভাগ থাকলেই তার একটি বর্গ নির্মাণ হয়, আর তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে মহামারী বা অতিমারীকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা যা একই সঙ্গে দ্বান্দ্বিক, কিছু অর্থে বহুমাত্রিক।আমরা জানি, রোগ, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়গুলি ঐতিহাসিকভাবেই ইউরোপ কেন্দ্রিক, সাম্প্রতিককালে তা পশ্চিমিকেন্দ্রিক অর্থাৎ জনসংখ্যার সাথে জনস্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। আর সেখানেই মহামারী বা অতিমারীর সংজ্ঞারও বিভিন্নতা আছে বলে মনে করি, অর্থাৎ প্রাচ্যের দেশে কতজনের মৃত্যু হলে মহামারী বলা যেতে পারে এবং পাশ্চাত্যে তা কত এ হিসেবের পার্থ্যক্যই সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য ধারণা দুটি পৃথক। ব্যাক্তির স্বাস্থ্যের উন্নতির মাধ্যমে সমগ্র জনজাতির উন্নতি সম্ভব এমন নয়। এখানে রাষ্ট্র, আইন ও পরিবেশ সমগ্র ব্যবস্থার মৌলিক উন্নতির ফলেই জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব। ঐতিহাসিকগতভাবে যখন জনস্বাস্থ্য আলোচনার বিষয় হয় তখন শুধুমাত্র একমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তা বোঝা সম্ভব নয়। সেখানে সাধারন ভাবেই কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন চলে আসে যেমন, কেন মানুষের মৃত্যু হার বাড়ছে, মানুষের রোগ প্রতিরোধ দুর্বল হওয়ার কারন কি, সঠিক পুষ্টি বিন্যাস ও আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যে কি সম্পর্ক, প্রভৃতি প্রশ্নগুলি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার আলোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। মহামারী ও অতিমারীর ইতিহাস আলোচনা শুধুমাত্র জন্ম মৃত্যু হার বা রোগ জীবাণুর ইতিহাস নয়, এখানে ঐতিহাসিকতার যে কাঠামো তার প্রাসঙ্গিকতা ও ব্যাখ্যা সমানুপাতিক ভাবেই প্রয়োজন। তা না হলে জনস্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্য আলোচনা উন্নয়ন অবনয়নের তথ্য হিসাবেই রয়ে যাবে, ইতিহাসের বলয়কে তা কখনই আলোকিত করবে না।আসলে জনস্বাস্থ্য কি এ প্রশ্নটি শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক বা রাশি বিজ্ঞানের সন্ধর্ভে বোঝা শক্ত। স্বাস্থ্যের মধ্যে যখন ‘জন’ শব্দটির ধারণা গড়ে ওঠে জনস্বাস্থ্য তখন শুধুমাত্র অরাজনৈতিক বা বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে থাকে না। ঐতিহাসিক ভাবে স্বাস্থ্যের ধারণার সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা, বর্ণভেদ প্রথা

এমনকি মেধাবৃত্তি জড়িত অর্থাৎ, স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো ও জনসংখ্যার চাহিদা যোগানের যে অসাম্যতা সেখানেই অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় 'সোসাল চয়েস থিওরি' বা কাদের স্বাস্থ্য সর্বাধিক প্রাধান্য পাবে তা স্বাভাবিক ভাবেই বিতর্ক ও আলোচনার পটভূমিকা তৈরি করে। এ সম্পর্কে একজনের কথা না বললেই নয়। পল ফার্মার ছিলেন হার্ভাড মেডিকেল স্কুল থেকে পাশ করা ডাক্তার এবং মেডিকেল অ্যানথ্রপলজিতে পিএইচডি। তাঁর গবেষণার কাজের জন্য তাঁকে গিয়ে থাকতে হত হাইতিতে। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন কিভাবে উন্নয়নের নামে নদীতে বাঁধ বেঁধে গোটা গ্রামটাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল। সেই গ্রামের মেয়ে অ্যাসিফিকে যেতে হল শহরে কাজের তাগিদে; সেখানে মালিক ও মেলেটারির উগ্র যৌন লালসার পথ ধরে তার দেহে বাসা বাঁধল এইচআইভি, সেই খোঁজ থেকে পল তুলে আনলেন স্বাস্থ্যের সামাজিক সম্পর্ক গুলিকে- গড়ে তুললেন স্বাস্থ্যের জৈব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। স্বাস্থ্য মানে কেবল ওষুধ বা চিকিৎসা নয়, জীবাণু বা ভাইরাসের আক্রমণ নয়, স্বাস্থ্য মানুষে মানুষে সম্পর্ককে, জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্ককে দ্বিমাত্রিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত নরওয়েজিয়ান সমাজতাত্ত্বিক জোহান গ্যাল্টাং এর সমাজকাঠামো গত হিংসার ধারণার সাহায্য নিয়ে পল খুজে দেখতে লাগলেন 'কারা বাঁচে, আর কারা মারা যায়!'।শুধুমাত্র আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা বা সোভিয়েত ভেঙ্গে তৈরি হওয়া দেশগুলিতেই নয়, আমেরিকাতেও লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে রোগে, বিনা চিকিৎসায়, অপচিকিৎসায়। পল দেখলেন, কিভাবে অনাহার, অশিক্ষা, দারিদ্র ও স্বাস্থ্য পরিসেবার অভাবের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে আছে মানুষের স্বাস্থ্য; আবার এও দেখলেন কিভাবের অস্বাস্থ্যের কারণগুলিকে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আফ্রিকার স্বাধীন মানুষকে দাসে পরিণত করার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসনে দেশগুলিকে যুগ পরম্পরায় হতশ্বাস রেখে দেওয়া হল যার পরিণতি রোগের নিরবিচ্ছিন্ন আক্রমণ ও অকাল মৃত্যু।অথচ এর জন্য দায়ি করা হতে লাগল চাপিয়ে দেওয়া অসহায়তা বয়ে বেড়ান

মানুষগুলকেই। বলা হল অসংযমী জীবনযাপনই তাদের রোগের মূল কারণ। এর বিরুদ্ধে পল ও তার সহযোগীরা বললেন, উন্নত বিশ্ব তাদের শোষণের ভিতর দিয়ে রোগটা দেবে, ওষুধ দেবে না সেইটা হতে পারে না। পলের বাস্তব গবেষণা দেখাল, কিভাবে 'রোগ নিরাময়ের চেয়ে ভাল হল রোগ প্রতিরোধ'- এই আপ্তবাক্যের আড়ালে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে বেঁচে থাকের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সামাজিক চয়ন পদ্ধতি বা সোশাল চয়েস থিয়োরির আধুনিক সংজ্ঞাকার বা জনক হলেন Kenneth Arrow। তাঁর সামাজিক চয়ন পদ্ধতির মূল কথা হল অসমতার মধ্যে একধরনের ভারসাম্য খোঁজা। এই সামাজিক চয়ন পদ্ধতি বিংশ শতকে এমন একটি দার্শনিকতার জন্ম দিয়েছিল যা স্বাধীন হবে এমন রাষ্ট্র, স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন রাষ্ট্র এবং পরবর্তি কালে স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইতিহাস যখন লেখা হয় তখন এই পদ্ধতি ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবীদ এবং দার্শনিকদের ব্যপক ভাবে প্রভাবিত করে, যার মধ্যে অন্যতম হলেন অমর্ত্য সেন। এই সামাজিক চয়ন পদ্ধতিকে তিনি তাঁর স্বকীয় গবেষণার মাধ্যমে আরোও এগিয়ে নিয়ে যান এবং পরবর্তিকালে তিনি নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হন। এই পদ্ধতির মূল ধারণা হল, এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা বা এমন একটি যৌক্তিক ব্যবস্থার আলোচনা ও নীতি প্রণয়ন করা যেখানে নীতি, ন্যায় এবং স্বাম্যতা প্রাধান্য পাবে এবং যেখানে এক যৌক্তিক অধিকার তৈরি হবে যা রাষ্ট্রের থেকে কাম্য। এই প্রসঙ্গে বলা যায় অমর্ত্য সেনের ১৯৪৬ এর দূর্ভিক্ষ-এর উপর গবেষণায়ও সামাজিক চয়ন পদ্ধতির প্রভাব দেখা যায়। পরবর্তিকালে যখন স্বাস্থ্য নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক কাজ করেন বিশেষত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে যে বিভিন্ন ধরণের রোগ জন্ম নিয়েছিল, যে বিপুল জনসংখ্যার মৃত্যু হয়েছিল এবং যে দূর্ভিক্ষ হয়েছিল তা নিয়ে যখন গবেষণা করা হয়, সেখানেও এই সামাজিক চয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ হয়েছে বা হচ্ছে বলা যেতে পারে। অমর্ত্য সেনের মতে সমস্যা সমাধানের নতুন ব্যবস্থাপনা দিয়ে সামাজিক উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন দেশের সব লোককে তার মধ্যে ধরবার

চেষ্টা হয়। "অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ কাঠামোকে অনুধাবন করতে পারেনি বলেই ভারতীয় সমাজকে বারে বারে দূর্ভিক্ষ, মহামারীর সম্মুখীন হতে হচ্ছিল এবং মৃত্যু হারও খুবই বেশী ছিল। কিন্তু এমন নয় যে ঔপনিবেশিক দেশগুলি তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তা সমাধান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল।অমর্ত্য সেনের গবেষণা বিশেষত তাঁর পভার্টি এন্ড ফেমিনস গ্রন্থটি শুধুমাত্র দূর্ভিক্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসকেই চিহ্নিত করে না, ইতিহাসের কার্য কারণ তত্ত্বকেও এক বহুমাত্রিক আণুবীক্ষণিক প্রশ্নের সম্মুখীন করে যা উনিশ শতকে ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চার যে পদ্ধতি তাকেও প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে উপনিবেশিক বাংলায় সামাজিক ইতিহাসে মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সতীদাহ প্রথা বোধহয় সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য ও এর মধ্যে দিয়ে শাসক ও শাসিতের যে সম্পর্ক তাকে নতুন ভাবে দেখার সম্ভবনা তৈরি হয়। কারণ, সতীদাহ প্রথা সারা ভারতবর্ষেই বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন নামে, বৈচিত্রময় ঐতিহাসিক কাঠামোয় প্রচলিত ছিল।কিন্তু বাংলার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সতীদাহ প্রথার আলোচনা শুধুমাত্র ঐতিহাসিকতা দিয়ে বিচার করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, সতীদাহ প্রথা একটি কুসংস্কার যা রদ হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়, তাঁর সহযোগী ও ব্রিটিশদের দ্বারা এটুকু বললেই বোধহয় পুরোটা বলা হয় না। কারণ, সতীপ্রথার সাথে মৃত্যু, পিতৃতান্ত্রিক শোষণ, শোক, বাসনা ও দেহের সমাপ্তি ইত্যাদি দার্শনিক বর্গগুলি কখনও সরাসরি কখনও ভাষা, শাস্ত্র ও চেতনার অন্তরালে আলো ছায়াময় হয়ে উপস্থিতির জানান দেয়। এই অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি, আধুনিক ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায় কিভাবে সতীদাহ প্রথা রদের মাধ্যমে আধুনিকতার সন্ধান করছিলেন। উনিশ শতকের বহু বিখ্যাত ঐতিহাসিকরা সতীদাহ প্রথাকে একটি ধর্মীয় আচার, বিচার, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে দেখেছেন। কিন্তু সতীপ্রথা তো একটি

মৃত্যুরই গল্প, আর এখানেই রামমোহন রায় শাস্ত্র সংস্কারের উর্ধে গিয়ে দয়া, শ্রদ্ধা, ভালবাসার বর্গগুলিকে এনেছেন অনুভূতির মাধ্যমে। রামমোহন রায় সতীপ্রথা রদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত শোক থেকে সমূহ শোকের প্রতি সন্ধান করেছেন আর তাঁর এই বিচিত্রগামী মৃত্যু চিন্তাই উনিশ ও বিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসে বহুমাত্রা যোগ করেছে। উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসকে মৃত্যুর চোখ দিয়ে দেখলে ঔপনিবেশিক শাসনের যে দমন ও আধিপত্য তার বিরুদ্ধে দেশীয় শুদ্ধ চেতনা অইউরোপীয় আধুনিকতার আদলে যে তৈরি হচ্ছিল তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়।এই অধ্যায়ে আরও দেখিয়েছি, উনিশ শতকের চিন্তাবিদরা কিভাবে মহামৃত্যুর সন্ধান করছিলেন এবং এক ধরণের ধর্মীয় মৃত্যু সংস্কৃতি নির্মাণের মাধ্যমে স্বমৃত্যুর ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন। কলিকাতা সমাজের বিভিন্ন বাবু ও জমিদারেরা কিরকম ভাবে মারা যেতে চান, তাঁর বর্ননাও পাওয়া যায়। এ সময়ে থিওসফিকাল সোসাইটি, ব্রাহ্মসমাজ ও আরও অনেক সভা, সমিতি তৈরি হচ্ছিল যেখানে পরলোক চর্চা, প্রেতচর্চা, প্ল্যানচেট, তান্ত্রিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই অধ্যায়ে আরও দেখিয়েছি রবীন্দ্রনাথ যেমন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত আধুনিকতার সন্ধান করছিলেন, অপরদিকে বিবেকানন্দ আধুনিক যুবসমাজকে দেশের জন্য মৃত্যু বরণ করার কথা বলছেন, যা পরবর্তিকালে ঋষি অরবিন্দ থেকে সুভাষ চন্দ্র বসুকে ও বাংলার বিপ্লবীদের প্রভাবিত করছে। গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও মৃত্যু বরণ করার যে সম্পর্ক তাঁর নব্য রাজনৈতিক দর্শন তৈরি হচ্ছে। কিছুটা বলা যেতে পারে, স্বদেশী আন্দোলনে মৃত্যু বরণ করার যে গৌরব তৈরি হয়েছিল তা গান্ধীর রাজনৈতিক কর্মকান্ড কিছুটা গৌরবের উজ্জ্বলতাকে অন্তর্মুখীন করে তোলে। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন মৃত্যু কেন্দ্রিক গল্প উপন্যাস ও তার ঐতিহাসিকতাকে সংক্ষেপে বোঝার চেষ্টা করেছি এবং এই উনিশ শতকেই পাশ্চাত্য দেশে দার্শনিকদের মধ্যে মৃত্যু ও তার পরবর্তি অনুষঙ্গগুলিকে নিয়ে যে চর্চার ঢেউ উঠেছিল তার তরঙ্গ ভারতেও এসেছিল, তাকে ইতিহাসের

সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করেছি। বিশেষত আলোচনা করেছি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ও তাঁর চেতনা সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথের একের পর এক ব্যক্তিগত মৃত্যু শোক কিভাবে সমগ্র বাঙালি সমাজকে এক উত্তরণের পথ দেখাচ্ছে ও পরোক্ষ ভাবে ইতিহাস চেতনাকেও প্রভাবিত করেছে। শোক পালনের মধ্যে যে এক আত্মাভিমান আছে তা ঔপনিবেশিক আধিপত্যের যে আধুনিকতা তাকে প্রতিরোধ করে। আলোচনা করেছি শোক কি? শোক কিভাবে মানুষকে ব্যক্তিগত করে তোলে এবং শোকের মধ্যে দিয়ে ভাষার সীমাবদ্ধতা কিভাবে প্রকট হয় ও একটি সমাজ কিভাবে বিকল্পতার সন্ধান করতে বাধ্য হয়। যে বাধ্যতা স্বইচ্ছার। এ প্রসঙ্গে শোকের সাথে, দেহ ও মনের সম্পর্ক কি তা বোঝার চেষ্টা করেছি। শোক আমাদের ভিতরের মধ্যে যে আমি তাঁর বিপরীতে এক অপর আমিকে বসায়, যার সঙ্গে নিরন্তর কথাবার্তা চলে এবং তা নিজের আমিত্বকেই বৃহৎ করে দেয়। আসলে ফ্রয়েডের মৃত্যু সম্পর্কিত শোকের যে চিন্তা সেখানে ফ্রয়েড মনে করেন শোকের মধ্যে দিয়েই শোকের উত্তরণ সম্ভব। কবি বুদ্ধদেব বসু মনে করতেন যাহাই ব্যক্তিগত তাহাই পবিত্র। এই ‘ব্যক্তিগত’ ও ‘পবিত্রতা’ এই দুটি শব্দেরই সামাজিক ও চলেয়মান ঐতিহাসিক চালচিত্র আছে, যা রাষ্ট্র, সমাজ, গোষ্ঠী এবং অপরদিকে এক বিতর্ক ভাবনার প্রতিকল্পের জন্ম দেয়, যেখানে সমূহ নয়, সমূহের শোক নয়, ব্যক্তির যে ব্যক্তিগত মনন সেখানে শোকের এক শারীরবৃত্তীয় পক্রিয়া যার বিমুর্ত প্রকাশ আছে, তার জন্ম হয়। তখন তা ব্যক্তিগত ও পবিত্রতার মধ্যে এক আন্তরিক সহাবস্থান লাভ করে। উইটগেইন্সটাইন এর মতে এখান থেকে ভাষারও জন্ম হয়।শোক সম্পর্কে আলোচনায় রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বাধ্যতামূলক ভাবে এসে পড়ে অর্থাৎ বর্ণ হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে ভারতীয় সমাজে যেভাবে মানুষের শোকের সামাজিক ইতিহাস আছে বা শোক বহিঃপ্রকাশের যে ভাষা, প্রতিধ্বনি বা প্রতিনিধিগত সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরাল যোগাযোগ আছে, তার ফলে শোকের সামাজিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব, যেমন কীর্তন , শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণসভা,

স্মৃতিচারণ। কিন্তু এই বক্তব্যের একটি অপর চিত্রও আছে যেমন অতিমারী, দূর্ভিক্ষ, গণহত্যা তখন শোক এর পবিত্রতার যে আলঙ্করিক মাত্রা আধুনিক নাগরিক জীবন দেখতে অভ্যস্ত তা এখানে ব্যতিক্রম। এখানে মৃতদেহের বদলে লাশ, শোকের বদলে সংখ্যা, পবিত্রতার বদলে বীভৎসতা ইত্যাদি শব্দগুলি যেন এক একটি বিকল্পের প্রতিনিধি হয়ে তথাকথিত সামাজিক ইতিহাসকে মাত্রাহীন নগ্নতার সামাজিক আয়না হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধরে, তখন পাবলিক, প্রাইভেট, পবিত্রতা নিয়ে যে বিতর্কগুলি আমরা করি তা যেন অতিরিক্ত পার্থক্যের কারণে চিহ্নিত করণের যে সুবিধা তা প্রায়শই অচিহ্নিত ইতিহাস হিসেবেই রয়ে যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে মৃত্যুর ইতিহাস অনুসন্ধানে শ্মশানের ইতিহাসও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচনা করেছি। বিশেষত সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে শ্মশানের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ ভাবে তাৎপর্য বহনকারী। আলোচ্য অধ্যায়ে শ্মশানের ইতিহাসকে দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছি। একটি হল শ্মশানের সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক দিক, অন্যটি হল শ্মশান সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তা ও চেতনার ইতিহাস।সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক দিকটিতে দেখিয়েছি শ্মশানের স্থাপত্য, শ্মশানের ভৌগোলিক অবস্থান ও শ্মশান সম্পর্কিত বিভিন্ন জড় উপাদান কিভাবে শ্মশান ব্যবস্থাটির সাংস্কৃতিক চিহ্ন বহন করছে। এই প্রসঙ্গে শ্মশান সংলগ্ন কালী মন্দির বা শ্মশানকালীর কিভাবে সাংস্কৃতিক বর্গে ধর্মীয় চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটছে তা আলোচনা করেছি। অপরদিকে প্রাচীন হিন্দু রীতিতে শ্মশানের যে সামাজিক, দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় দিক আছে তা আলোচনা করেছি। বর্তমানে প্রচলিত শবদাহের রীতিনীতির সঙ্গে প্রাচীন সমাজের শবদাহের রীতিনীতির বিস্তর তফাৎ লক্ষ করা যায়। বর্তমানে শবদাহের জন্য নির্মিত বৈদ্যুতিক চুল্লি বা বাঁধানো ঘাট ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে সুনির্দিষ্ট করে শ্মশান হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও প্রাচীন যুগে শ্মশান সম্পর্কে এই রকম ধারণা গড়ে ওঠেনি বলা চলে। শ্মশানের স্থান নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রগুলিতে বলা হয়েছে শ্মশান সবসময় হবে গ্রামের উত্তরপ্রান্তে এবং তার জমির

ঢাল হতে হবে দক্ষিণ দিকে। স্থান নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন তার আশেপাশে নদী কিমবা জলাশয়ের উপস্থিতি থাকে।আলোচনা প্রসঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন শ্মশান ঘাটগুলির ইতিহাস মূলত কাশীশ্বর মিত্র শ্মশান ঘাট, নিমতলা শ্মশান ঘাট ও কেওড়াতলা মহাশ্মশানের ইতিহাস আলোচনা করেছি। এই ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকের বিশেষত মধ্য উনিশ শতকে তাদের যে নব্য আধুনিকতার বর্গে দূষণ-রোগজীবাণু, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সপর্কে যে ধারণা গড়ে উঠছিল তার সঙ্গে ভারতীয় শ্মশান ব্যবস্থার যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তার বিরোধ লেগেছিল। এই আলোচনার বর্গে ব্রিটিশ সরকার হিন্দু ধর্মীয় চেতনার ধারণাটিকে ধরতে পারেনি, তার বদলে ভারতীয় শ্মশান সম্পর্কে তাদের এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। বাংলার স্যানিটারি কমিশনের সভাপতি জন স্ট্রাচি ১৮৬৪ সালে ৫ ই মার্চ লেখেন, যে নদী কলিকাতার অধিকাংশ লোককে পানের ও রন্ধন ইত্যাদি গৃহ কার্যের জন্য জল যোগায়, সেই নদীর জলে প্রতি বছর পাঁচ হাজারের উপর মানুষের মৃতদেহ নিক্ষেপ করা হয়। ১৮৭৫ সালে পোর্ট কমিশনার নালিশ করেন যে নিমতলা ঘাট থাকার জন্য তাদের রেল চলাচলের পথে বাঁধা তৈরি হচ্ছে। এই নালিশের ফলে ম্যাকিন্টস বার্ন কোম্পানিকে দিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে বর্তমান জায়গায় নিমতলা শ্মশান ঘাট তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি ইউরোপেও আধুনিক ক্রিমেশন পদ্ধতি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল যার অভিঘাত ঔপনিবেশিক বাংলা তথা ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল। উন্মুক্ত অগ্নিসৎকারের বদলে ঘেরা জায়গায়, শহর থেকে দূরে, চিমনির মাধ্যমে ধোঁয়া নির্গমন ও যথেষ্ট বায়ু চলাচলের যাতে ব্যবস্থা থাকে তা সনাতন অগ্নিসৎকার ব্যবস্থার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল। এসম্পর্কে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন, সনাতন ও আধুনিক ব্যক্তি বর্গের মধ্যে যে যুক্তিতর্ক তা আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। শ্মশান ব্যবস্থাকে সরাসরি চাক্ষুষ করার জন্য হুগলী, উত্তর চব্বিশ পরগণা ও কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত শ্মশান পরিদর্শন করেছি। সেখান থেকে এই অন্ত্যষ্টি ক্রিয়ার সাথে যুক্ত বিভিন্ন

মানুষজনের সাথে কথা বলে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। বিশেষত একটি ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। কাঠে পোড়ানোর বীভৎসতার মধ্যে দিয়ে উচ্চবর্গীয় বর্ণহিন্দুদের আধুনিক সময়ে একধরনের নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ করা যায়, কিন্তু হুগলী জেলার ত্রিবেণী মহাশ্মশানের নিম্ন বর্গীয় মানুষের মধ্যে কাঠে পোড়ানোর ঝোঁক প্রবল। তার কারণ হিসেবে তারা আমায় জানিয়েছেন কাঠে পোড়ালে আত্মার মুক্তি দ্রুত হয় ও পুণ্যলাভ এতে বেশী। ইতিহাসের সঙ্গে স্থান, কাল, পাত্রের যেমন যোগ আছে, তেমনই শ্মশানের ইতিহাস শ্মশান স্থান হিসেবেই বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শ্মশানে গেলে যেমন চিত্ত শুদ্ধি হয়, আবার তেমন ভয়ের সঞ্চারও করে এবং ভাষার ব্যখ্যার অতীত এমন এক অনুভূতির জন্ম দেয় যা ভবিষ্যতের চিন্তা চেতনাকে নির্দেশিত করে। উনিশ শতকের সমাজবীদরাও শ্মশান চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কালীপ্রসন্ন ঘোষ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাদের বিভিন্ন লেখায় কখনও সরাসরি কখনও পরোক্ষ ভাবে শ্মশান চিন্তার বা শ্মশানের মধ্যে দিয়ে যে দেহের অন্তিম সৎকার হয় তা তুলে ধরেছেন। আর এই দেহের অন্তিমতাকে নিয়ে উনিশ শতকের চিন্তা চেতনার ইতিহাসে বিশেষ স্থান বা বর্গের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শ্মশানের ইতিহাস এক ধরনের ঐতিহাসিক ‘Space and histiriocity’ এর জন্ম দেয়, যা বর্ণহিন্দুর পাবলিক, প্রাইভেট শোকের সংজ্ঞাটিকে প্রতিরোধ করে অর্থাৎ উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসের কাঠামোতে বর্ণহিন্দু সমাজের যে নাগরিক চেতনা, শ্মশানের গল্প ও তার সম্পর্কিত অনুগল্প, তা সেই চেতনার পূর্ণতাকে বিচ্ছিন্ন পরিচিতির মাধ্যমে এক লৌকিক (general) বর্গ নির্মাণ করায় যা সামাজিকতার বৃত্তায়ণকেই পূর্ণতা দেয়। এই সম্পর্কে তিথি ভট্টাচার্য্য তাঁর ‘Deadly space; ghost, histories and colonial anxiety in nineenteen century Bengal’ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, কিভাবে সুখীঘর বা প্রাইভেট স্পেস, অন্যদিকে শ্মশান ঘাট, পুরনো বাড়ি, ভৌতিক ও অতিপ্রাকৃত স্থানগুলি বিকল্প আত্মচেতনার সন্ধানের স্থান হিসেবে গড়ে উঠছে। এ প্রসঙ্গে তিনি অবনীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের ‘আপন কথা’ প্রবন্ধটি আলোচ্য আলোচনায় ব্যবহার করেছেন। আমার গবেষণার সন্দর্ভে শোক নিয়ে আমি বিস্তর আলোচনা করেছি কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ের শ্মশানের ইতিহাসে যম ও চণ্ডালদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি বিষয় নজরে আসে, যে অগ্নিসৎকারের সাথে যুক্ত মানুষদের কি শোক হয় না? ছোটবেলা থেকেই শ্মশানে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এই মানুষগুলো মৃত মানুষের বালিশ, বিছানাকে বা সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করেন এবং জিজ্ঞাসা করলে তারা জানান শোক করার সময় কোথায়? মৃত্যুতো অনিবার্য, অর্থাৎ শোকেরও শ্রেণী বিভাগ আছে আর এখানেই সামাজিক ইতিহাসের সামাজিকতার বহুমাত্রিক প্রশ্নের জন্ম নেয়।

পরিশেষে বলা যায়, ঐতিহাসিকের যে কোন ধরণের সৃজনশীল ক্রিয়াকান্ড বা কারুকৃতি প্রথমে মননে জারিত হয়, পরে প্রয়োগে সিদ্ধি পায়। তবে সৃষ্টির এই দ্বিত্ব প্রক্রিয়াতে মাঝে মাঝে চুতি বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। ইতিহাসের মধ্যের ‘তথ্যের’ বর্গটিকে ‘অর্থের’ (meaning) বর্গে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোন না কোন আদিকল্পের প্রতি এক নিষ্ঠায় ও অভ্যাসের অনুজ্ঞায় আমরা এক ছকে পরে যাই। বিষয় প্রাচুর্য বা তথ্যের সমাবেশে ছকের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে কিন্তু বৃত্তের ধরাবাঁধা বেষ্টনীর বাইরে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। ঔপনিবেশিক ইতিহাসের আদিকল্পের প্রস্থানের বাইরে গিয়ে মৃত্যু, শোক, দুঃখ প্রভৃতি অনুভুতিগুলিকে বুঝতে হবে। জাতীয়তাবাদ, আধুনিকতা, সামাজিকতা ও ঐতিহাসিকতার মতো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মতবাদ গুলিকে কোন এক আদি অকৃত্রিম আর্কাইভস্-এর অটুট বৃত্তান্তে বোঝা বা অতলান্তে পৌঁছানো প্রত্যাশিত ও সম্ভব নয়। ছড়ানো ছিটনো ‘অর্থ’ (meaning) বর্গের এক্তিয়ারে এনে অনেক গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন অনুষঙ্গতা লাভ করতে পারে, এখানে ইতিহাস ও সামাজিকতা অন্তরঙ্গতা পায়। শোক ও মৃত্যুর ইতিহাস এক বৃহৎ সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্দর্শন কে নির্দেশিত ও

প্রাগভিজ্ঞতায় বৃত্তায়িত করে চিন্তার গোলকায়ন ঘটায়। উপনিবেশবাদের মরণসত্ত্বার কুমতির বিরুদ্ধে মৃত্যুর শোক দুঃখ প্রভৃতি বর্গগুলি কখনো শাসিত মানুষের কখনো জ্ঞানের মাধ্যম বা প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে। মৃত্যু শোক দুঃখ ভারতীয় ব্যক্তিক ও সমষ্টিগত মননের অঙ্গহীন চেতনার স্পর্শ 'ছোট আমিকে' 'বড় আমির' কাছে তুলে দেয়। উপনিবেশিক আধুনিকতার যুক্তিভূমি ও কল্পভূমির সংযোগ ও সমবায়ের মধ্যে কিভাবে শোকের রাজনীতি বিপ্লবীদের মৃত্যুবরণ উপনিবেশিক শাসকের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা কে চিহ্নিত করে তার মধ্যে দিয়ে সামাজিক ইতিহাসের দুটি বর্গ সমানুভূতি ও সহানুভূতির জন্ম দেয়। উন্নিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসের ঈপ্সাতে বৌদ্ধ করুণা, হিন্দু দয়া, খ্রিস্টানের কল্যাণকর দিকটি কখনো উপেক্ষা বা অপেক্ষার ছায়া অস্পষ্ট উত্তরের আধুনিক চেতনার কামনার অনুষঙ্গ লাভের অপেক্ষারত । হয়তো মৃত্যু শোক যাপনের ইতিহাসই বর্তমানের শরীরের মধ্যে দিয়ে অতীতের অপেক্ষারত চেতনারই বিশেষ বাসনার ফল।

গ্রন্থপঞ্জী

ক) মুখ্য উপাদান

১। Rebay-Salisbury, Katharina, Inhumation and cremation: how burial practices are linked to beliefs, Embodied Knowledge, 2012, Pp.15-26.

২। Sørensen, Tim Flohr and Bille, Mikkel, Flames of transformation: the role of fire in cremation practices, World Archaeology, 2008, vol. 40, no. 2, Pp. 253–267.

৩। Erichsen, Hugo, The cremation of dead, from aesthetic, sanitary, religious, historical, medical, and economical standpoint, Detroit, Do. Haynes, 1887.

৪। Indian Sanitary Proceedings, 1919, vol 10588.

৫। Census of India 1921, I, Part I.

৬। The Calcutta Municipal Report, “Report on Public Health”.

৭। Indian Medical Proceedings, 1873-1875.

৮। First Annual Report of the Sanitary Commission for Bengal 1864-1865. Calcutta Military Orphan press.

৯। Arnold, David, Burning issues: Cremation and incineration in Modern India, NTM, 2016 Dec, vol. 24, no. 4, Pp. 393-419. doi: https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00048-017-0158-7.

১০। Klein, Ira, Imperialism, Ecology and Disease: Cholera in India, 1850- 1950, The Indian Economic and Social History Review, 1994, vol. 31, no. 4, Pp. 491-518

১১। Klein, Ira, Death in India, 1871-1921, Journal of Asian Studies, vol. XXXII, no. 4, Pp. 639-59.

খ) গৌণ উপাদান

১। Eassie, William, Cremation of the dead, its history and bearings upon public health, C.E., London, Smith, Elder & Co., 15 Waterloo place, 1875, Pp. 5.

২। Bachelard, G, The Psychoanalysis of Fire, Boston, MA: Beacon Press, 1968.

৩। Indian official Records (British Library London, Bengal Judicial (Jails), nos. 2-4, 1815 11 August.

৪। রাহা, জয়তী, দাহ পুরানের বিবর্ণ অতীত বইছে শহরে, আনন্দ বাজার পত্রিকা, কলকাতা, শনিবার ২০১৯ ১০ আগস্ট।

৫। ‘বায়ুর সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ’, http://dspace.wbpublibnet.gov.in:8080/jspui/bitstream/10689/17392/5/Chapter%202_51-98p.pdf, পৃ: ৫৬-৫৭।

৬। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *ইতিহাস অনুসন্ধান- ২৬*, মহুয়া সরকার, ‘উনিশ শতকের বাংলার জীবন ও জীবনচর্চা’, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৩৬-৪৮ ।

৭। Sarkar, Mahua, *The Gasping City: An Environmental History Of Calcutta (1817-1923)*, in Press.

৮। দত্ত, শ্রী বিভুভুষন (সম্পাদিত), *ভারত সাধনা*, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩৩৭ কার্ত্তিক প্রথম সংখ্যা ।

৯। সেন, বিনায়ক, *সাহিত্য, অতিমারি ও সমাজ*, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ১৪২৭, খণ্ড ৩৮, বার্ষিক সংখ্যা।

১০। Arnold, David, *Plague: Assault on the Body, in Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-century India*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1993, Pp. 200-39.

১১। Samanta, Arabinda, *Living with epidemics in colonial Bengal 1818-1945*, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2018, Pp 109-110.

১২। Hays, JN, Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History, Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2005, Pp. 193.

১৩। Harrison, Mark, A dreadful scourge: cholera in early nineteenth-century India, Modern Asian Studies, vol. 54, no. 2, Pp. 511.

১৪। সেন, যতীন্দ্র কুমার, একটি বিগত স্মৃতি, দেশ, ২০২১ ১৭ই জুন, পৃ: ১৪.

১৫। Sen, Amartya, Home in the World A Memoir, Penguin UK, 2021, Chapter 10th, 11th & 13th.

১৬। Sen, Amartya, Poverty and Famines An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford University Press, Chapter 1st Pp 1-8, 6th pp 52-85.

১৭। Sen, Amartya, Poverty and Famines An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford University Press, Chapter 6th Pp 52-85.